লা পেরুজের সূর্যাস্ত

রাবেয়া খাতুন

ইমদাদুল হক মিলন

এর

দুই বাংলার দাম্পত্য কলহের শত কাহিনী- থেকে সংকলিত

লা পেরুজের মনোরম বিকালে বেড়াতে এসে মন খারাপ হয়ে গেল। আমরা হাঁটছিলাম

প্রশান্ত মহাসাগরের পাড় ধরে। তিন রঙা পানির ঢেউ-এর গা ছুঁয়ে চমৎকার পাথরের ভিউ। সৈকতে পড়ে থাকা এক ধরনের অদ্ভুত পাথরের চাই। নিটোল গোল গোল গর্ত। ভেতরটা ভরা নোনা পানিতে। এক সারে অজস্র। হঠাৎ তাকালে থমকে দাঁড়াতে হয়। এক সঙ্গে অনেকগুলো বিষণ্ণ চোখ যেনো তাকিয়ে আছে।

জামিল সেদিকে না তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো লা পেরুজ মনুমেন্টের দিকে। বল্লো, সন্ধ্যায় এখনো এই গরমেও রীতিমতো ঠাণ্ডা কিন্তু।

টের পাওয়া যাচ্ছিলো হাড়ে হাড়ে। পিকনিক করতে আমরা এসেছি সেই সকালে। রোদে তখন বেশ ঝাঁজ। বারবি কিউতে চিকেন কাবাব, কড়াইর সামান্য তেলে সসেজ ভাজা। ঘেমে ঘেমে হাত বদল হচ্ছিলো ঘন ঘন। এই সামারে সিডনির আবহাওয়ার তাপ যাই হোক, দুপুরের পর থেকে বইতে থাকে শীতল বাতাস। তবু লোজন থেকেই যায়। লা পেরুজের বিখ্যাত সূর্যাস্ত দেখার জন্য।

এই মহাদেশের এক তীরে কবে এন্ডিভার জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন ইংরেজ নাবিক জেমস কুক। তার পিছু ধাওয়া করে ঠিক উল্টো দিকের উপকূলে দুর্গ গড়েছিলো ফরাসীরা। তারই স্বাক্ষর বইছে একটি মিউজিয়াম, টাওয়ার। মিউজিয়ামটি সংস্কারের জন্য বন্ধ। তার চারদিকে সারাক্ষণ দাবড়ে বেড়াচ্ছে গোটা দুই বাঘা কুকুর। ব্রীজের এদিক থেকেও কর্কশ ডাক স্পষ্ট। জামিলের ঠোঁটে ফুটলো বাঁকা হাসি-এতো মূল্যবান যাদুঘর পাহারা দিচ্ছে কয়েকটা কুকুর। ক্যানো জানেন? মানুষের শ্রমের দাম অস্ট্রেলিয়ায় খুব বেশি। অথচ বেকারের লাইন দিন দিন লম্বা হচ্ছে।

কোনও সাড়া না দিয়ে ওকে নিয়ে যেতে সাহায্য করলাম ওর পূর্ব প্রসঙ্গে। মানুষের কিছু লুকোন কথার সম্পদ থাকে যার ডালা সহজে তারা খোলে না। কিন্তু লক্ষ্য করেছি কবি সাহিত্যিকদের কাছে তারা আপনা থেকে ক্যানো যেনো সহজ হয়, বলার জন্য সুযোগ খোঁজে। কে জানে হয়তো, সৃষ্টিশীল কারু কাছে সাময়িক নায়ক হবার গোপন পুলক অনুভব করে, কিংবা কি পুরোপুরি আবিষ্কার করতে পারি না। তার মধ্যে আপন গরজ অথবা বলার নেশা আবার পেয়ে বসে জামিলকে-জারাকে ভালোবাসার কথা আমার মধ্যবিত্ত মা জানতে পেরে বলেছিলেন, সমানে সমানে হলে বিয়ে সম্মানের হয়।

আমি খুব বিরক্ত হয়েছিলাম। বালক বয়সে যে বাবাকে হারিয়েছি, তাকে নিয়ে আক্ষেপ কিছু ছিলো না। রাজনীতি করতেন। না থাকতেন বেশি ঘরে, না দিতে পারতেন ছোট্ট সংসার চলার মতো টাকা পয়সা। মা মাস্টারী করে যা পেতেন, কষ্টে চলতো। মাথার জোরে বুয়েটের ছাত্র হয়েছিলাম।

সে বছর ছেলেমেয়ের সংখ্যা পঞ্চাশ। জারা গুলশানের মেয়ে। পোশাকে যতো আপটুডেট ঝকমকে ছিলো, মগজে ততো নয়। আমি ওকে ডিজাইনে, মডেলিং-এ বলতে গেলে সব কিছুতেই সাহায্য করতাম। বিয়ের প্রোপোজাল আমিই দিয়েছিলাম। তবে ভালোবাসার কথা ওই প্রথম বলেছিলো। ওর বাবা-মা অমত করেনি। শর্ত শুধু একটি, জারার সঙ্গে গুলশানে থাকতে হবে আমাকে। ওর মা খুব নরোম করে বলেছিলেন, আমাদের বাবা সন্তান বলতে দুটি মেয়ে। ফারাহ বিদেশে। জারাকে বাইরে দিয়ে এত বড় ক্যাসেলের মতো বাড়িতে বুড়োবুড়ি দম বন্ধ হয়ে মরবো।

আমার নয়, আপত্তি ছিলো আমার মাস্টার মায়ের। কিন্তু গ্রাহ্য করাটা বোকামি মনে হয়েছিলো। আরকিটেকচর পাস করার পর ফার্ম খুলে বসলাম। দিনভর এক সঙ্গে থাকা, কাজ করা। মনে হচ্ছিলো পৃথিবীতে দুঃখ বলে কিছু নেই। ঈশান কোণে মেঘ জমছিলো টের পাইনি। এম এস করার জন্য দুজনই এপ্লাই করেছিলাম। এআইটিতে চান্স পেলো জারা। বাবা মার সঙ্গে আমাকে ক্যাসেলে রেখে চলে গেল থাইল্যাণ্ড। প্রথম বছরের ছুটিতে বেড়াতে এলো। স্বপ্ন দেখালো ফিরে এসে আরও জমকালো করবে ফার্মের চেহারা।

ভাবলাম একটাই তো বছর আর। দেখতে দেখতে চলে যাবে।

ব্যক্তিগত কথার চেয়ে জারার চিঠিতে পরের বস্ত্র বেশি জায়গা নিতে শুরু করলো থাইল্যান্ডে ভূস্বর্গ চিয়াংমাই ভ্রমণ, পাতাইয়া, ফুকেত, ফ্যান্টাসিল্যান্ড শ্যায়াম ওয়াটার পার্কের আনন্দময় বিবরণ-জানো জামিল গোল্ডেন ট্রাঙ্গেল চিয়াংমাইতে বেড়াতে গিয়ে দু'চোখের পাতা আর এক করতে পারি না। লালে লাল পপি, নীল সমুদ্র, সবুজ পাহাড়। তবে নিসর্গ তখনি অর্থময় যখন পাশে থাকে একান্ত কাঙ্ক্ষিত কেউ।

চিঠি নয়, অস্থির হয়ে ফোনে জানতে চাইলাম, কাদের সঙ্গে ঘুরছো? বন্ধুদের। দল বেঁধে বেড়াতে যাই গো, দল বেঁধে।

চৈতন্যে মেঘলা আকাশ। শেষের অন্তরঙ্গ টানা সুরটিতে কেটে যেতে দেরি হয় না। কিন্তু তক্ষণি ক্যানো যে চোখ যায় টিভির মাথায় আমাদের বাঁধানো যুগল ছবিটার দিকে। থার্ড ইয়ারে বুয়েট থেকে এসকারশন ট্রিপে আমরা ভারতে গেছিলাম। সেখানকার যে যে শহরে রয়েছে প্রাচীন এবং অতি আধুনিক অট্টালিকা, সেইসব দর্শন ছিল এই ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। বাঙ্গালোরের চমৎকার এক স্থাপত্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা দুজন। খুব ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে। যেন হঠাৎ ঝলকানির মতো মনে পড়লো ঐ ট্যুরের এক শুক্লপক্ষের সন্ধ্যায় আরব সাগরের পাড়ে জারা আমায় ভালোবাসার কথা বলেছিলো। প্রথম ভালবাসার বার্তা নয়ত, মহাকাশ থেকে আসা দুরাপ মদুবাক্য।

পরদিন সকালে আবার দেখা হতে আমি বলিছিলাম, জানো কাল সারারাত আমি শুধু চাঁদ দেখেছি।

কি আশ্চর্য আমিও তো।

আর গুনগুন করেছি, আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়, মনে পড়ে মোরে প্রিয়...

ধাৎ, আমি গেয়েছি লাভ ইজ হেবেন, লাভ ইজ লাইফ।

ঐ একই হলো। যাদের মনের মিল হয় তাদের চিন্তা ভাবনাগুলোও একই দিকে শাখা প্রশাখা মেলতে থাকে।

নো ডিয়ার এটা ঠিক নয়। ভালোবাসা মানে একে অন্যের পদদাস বনে যাওয়া নয়। আমরা দুটি আলাদা মানুষ কিন্তু সবকিছুতে মিল থাকবে এমন ভাবা বোকামি। আসলে তুমি এদ্দিন আমার সঙ্গে আছো মিডল ক্লাস নেচারটা থেকে পুরোপুরি বেরুতে পারছে না। মানে যাকে বলে ফুল এডজাস্টমেন্ট।

নির্মোহ মাপকাঠিতে যুক্তিগ্রাহ্য কথাগুলো আমাকে কেমন কারেন্ট শক খাওয়াতো। কিন্তু মগ্ন আচ্ছন্নতাই জয়ী হতে শেষ পর্যন্ত।

জারার এখনকার জীবন নিয়ে বাঁকা চোখে দেখা মানে রদ্দি ভাবনায় যাওয়া। কিন্তু যা চাই না সেই বলয় ক্রমাগত ধাবমান আমারই দিকে। প্রকৃতির সঙ্গে একজন পুরুষ স্পষ্ট হচ্ছে প্রতি হপ্তার চিঠিতে জানো–জামিল এ বছর আইটিতে জয়েন করেছে। জুনিয়র ব্যাচের রকি। দুর্দান্ত আবৃত্তিকার। নাচে দক্ষ। মে দিবসের জন হেনরীর নৃত্যনাট্যে নাম ভূমিকায় সে, প্রেয়সী স্ত্রীর রোলে জারা। হাতে-গলায়-মাথায় শ্বেত ফুলের মালিকায় অশ্রুময়ী জারা সত্যি যেনো কাঁদছে হাতুড়ি ধরা মৃত স্বামীর জন্য।

ছবিটা দেখতে দেখতে জ্বলি। জ্বলতে জ্বলতে হাতের পিঠে চোখ মুছি। আর সন্দেহ নেই। জারা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।

কোথাও স্বস্তি শান্তি নেই। ব্যাপারটা এমন কাস্ত্রে বন্ধুকেও বলা যায় না চট করে? বড়জোর কেউ বলবে ভুল দেখছি। কেউ করবে বিদ্রূপ।

হঠাৎই মনে পড়লো মাকে। কতোদিন যেতে বলেছেন। কান দেইনি। এখন খুব জরুরী মনে হচ্ছে তার সান্নিধ্য। কিছু উপহার নিয়ে মফস্বলে গেলাম। জিনিসপত্রের দিকে ফিরেও তাকালেন না। শুধু বঙ্গেন, টেলিপ্যাথির ডাক সত্যি শুনেছি। গোলাপবাস আমগাছে এবার এতে ফল এসেছে ঘড়ি ঘড়ি তোকেই শুধু মনে পড়ছে।

কি আশ্চর্য মফস্বলের এই ছোট্ট শহরে ঢাকায় পড়তে যাবার আগে আমার যে একজন ফিয়াসে ছিলো তার কথা একবারও মনে হয়নি। পৌঁছানোর দু'ঘন্টার মধ্যে মনে করাতে সেই এলো। একটু চটকদার বেশভূষা ছাড়া পরিবক্স তেমন চোখে পড়লো না বল্লো, এদ্দিন পর আমাদের মনে পড়লো।

তো, তা তুমি কি করছে?

ঘরসংসার।

রেসা হেসে পরক্ষণে বল্লেন, বলবে তো মান্ধাতা আমলের একঘেয়ে কাজ। তুমি বলেছিলে ঢাকায় নিয়ে গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে জোট বেঁধে দেবে। সংসার করবো। আবার প্রতিভা দিয়ে সমাজ সংস্কৃতি বোও করবো।

কিন্তু আমি না হয় কথা রাখতে পারি নি।

আর একজনের বেলাও সেটা আশা করা যায় না। তুমি তো বু শহুরে হয়েছিলে ও একেবারেই মফস্বলের মানুষ।

শুনেছিলাম ট্রাকের বড় ব্যবসায়ী।

পয়সা মেলাই আছে। কিন্তু স্ত্রীকে স্টেজে দেবার উদারতা কি থাকে সবার মধ্যে। তা সখ পুরণ না হোক। ভেবে দেখেছি এই দেশে ঘরে ঘরে শিল্পী। তাদের কেউ খুবই উন্নতি করতে যদি সুযোগ পেতো। তা পায় তো লক্ষে একজন। আমি তা আশা করে ব্যর্থ হয়ে সামলে নিয়েছি।

তাহলে তুমি সুখী মনোয়ারা।

তা বলতে পারো। মানুষটা ভালো। শাশুড়ীদের সঙ্গে থাকতে হয় না। আধপূরান একটা ফিয়াট আছে নিজস্ব। হাতখরচাও মাসে মন্দ পাই না।

মা এলেন খাবার হাতে। ফ্যাকাশে হেসে বল্লেন, তুই কি এসব শোনাতেই সাত তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছিস?

উম চাচী। সুখটা কারো একার সম্পত্তি নয়, তোমার ছেলেকে না শুনিয়ে শান্তি পাচ্ছিলাম না। ভয় হচ্ছিলো আবার কবে আসবে বা উড়াল দেবে ফিরতি ট্রেনে কে জানে। যে অস্থিরমতি ছেলে তোমার। তাই দৌড়ে আসা।

মনোয়ারা স্পষ্টবাদী কিছু ছিলো, কিন্তু এতোটা নয়। আমি অপমানিতবোধ করেছি কিন্তু রেগে উঠতে পারিনি। প্রিয়-প্রত্যাখ্যানের যে তাপ একদিন ওকে দমে দমে বহন করতে হয়েছে সেই জ্বালা এখন আমার বুকে। যে দহন মা নয়, বন্ধু নয় কেউ কমাতে পারে না। এটা ডিসেম্বর অব্দি ভোগ করতেই হবে। ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে জারা চলে আসবে।

পরীক্ষার মধ্যেই জারা জানালো ওর আসা হবে না। এআইটিতে ও একটা চাকরি পেয়েছে। তাছাড়া, সে চলে এলে রকির পাস করে বেরুনো মুশকিল হবে।

অনাহূত আমিই গেলাম বড়দিনের ছুটিতে। জারা এবং রকি পার্টটাইম চাকরি করছে। দুজনে মুখোমুখি ফ্ল্যাট ভাড়া করে আছে। ওদের প্ল্যান ছিলো ট্রেনে করে মালয়েশিয়া ভ্রমণ। দলের সঙ্গে রকি গেল, জারা রইলো। ভয়ংকর রাগ হলো। বল্লাম, চাকরির কি তোমার কোনও দরকার ছিলো? আর কোথাকার কোন রকি পাশ কি ফেল করলো তাতে তোমার কি যায় আসে? উম।

জারা চোখ নাচিয়ে জবাব দিলো, যায় আসে বৈকি, ও ভালো থাকলে আমি ভালো থাকি।

আর আমি যে এদিকে জ্বলে অংগার হয়ে যাচ্ছি।

অত মিন হচ্ছে ক্যানো?

কারণ আমি তোমায় ভালোবাসি।

ভালোবাসার মানুষ ভালো থাকলে তো খুশী হবার কথা।

সে যুগ পাল্টে গেছে।

তার মানে?

ভালোবাসার মানুষ পরকীয়ায় ভালো থাকলে আমি ভালো থাকতে পারি না। তার ভালো থাকা দেখে আমার চোখ টাটায়, বুক জ্বলে, বিষাক্ত হয়ে যায় দিবারাত্রির স্বাদ।

নাঃ স্বীকার করতেই হয় গুলশানের ক্যাসেলে থেকে তুমি অনেক সাহসী এবং পরিপুষ্ট হয়েছে।

কথার ভেতর আইব্রাসে চোখের পাতা লালচে করতে করতে বললো, কি শব্দটা বপ্পে যেনো-পরকীয়া। উম বাংলায় ঐ একটি চমৎকার শব্দ আছে, ছোট্টর ভের যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। হা করি পরকীয়া। স্বাদটা যে নিষিদ্ধ ফল খাবার মতো সর্বনেশে সুন্দর তুমিও তো জান।

আমি?

ইস এরই মধ্যে ভুলে গেলে। মনোয়ারার সঙ্গে বিয়ে না হোক, আমার সঙ্গে প্রেম করার পর যন্ত্রণা সে কি কোনও স্ত্রীর চেয়ে কম পেয়েছিল?

হাবিজাবি কথা রেখে স্পষ্ট বলল কি করতে চাও?

আমার যদ্দিন ভালো লাগবে আমি এমনি জীনযাপন করবো।

তাহলে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়াই তো ভালো।

হোক এক্ষণি।

চোখের পাতায় বাড়তি কয়েকটা পলক ফেলে বললো, যদি তুমি চাও।

মুখে যাই বলি, বুকে জোর পাই না। কি করব সে সিদ্ধান্তেও আসতে পারি না। তবে এটা পরিষ্কার আমার মধ্যে জারার জন্য যে ভালোবাসার গাঢ় অনুভূতি ছিলো, সেটা ফিকে হচ্ছে। ক্ষয় ধরেছে সম্পূর্ণ স্ট্রাকচারে। ভেতরের দাহ, বাইরের অপমান। ঘনিষ্ট বলয়ে ব্যর্থ বিয়ে একটি মজাদার প্রসঙ্গ। মাঝে মাঝে মার সেই কথাই মনে হয়, বিয়ে সমানে সমানে হলে সম্মানের হয়।

ক্রিসমাসের ছুটি সে কাটায় রকির সঙ্গে নাচানাচি করে, আমি নানা রং-এর বোতল টেনে কুঁদ হয়ে পড়ে থাকি অফিসে।

গুমোট পরিস্থিতি হঠাৎ কাটলো যেনো। জারা ফোনে বললো, এ্যাই ইমিগ্রান্ড হয়ে আমি সিডনি যাচ্ছি। এই সুযোগে তোমাকেও আনতে পারি। আসবে?

জানি না ক্যানো রাজী হয়ে গেলাম। মা এবার চোখের পানি ঝরিয়ে ছোট্ট করে বললেন, তবু তো চোখের কাছে ছিলি।

কি করবো আমার কোনও কন্ট্রোল নেই বুঝি নিজের ওপর। জারা এয়ারপোর্টে রিসিভ করলো। দুঘরের সাজানো ফ্ল্যাট। জানালা থেকে নীল সমুদ্র দেখা যায়। বিশ্বের দুর্লভ স্থাপত্য অপেরা হাউসের খানিকটা।

জারা দুরে থাকলে দুশ্চিন্তায় ভুগি। কাছে এলে সব ভুলে যাই। বুঝি না কি ওর মতলব। কুয়েত-ইরাক যুদ্ধের পর এখানকার অর্থনীতির অবস্থা নাজুক। বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। ডিগ্রী-মতো কাজ হচ্ছে না। কম্পিউটারের যুগ। সে বিষয়ে নতুন করে পড়ছে কেউ কেউ। ডাল ভাতের ভাবনা আমাদের ছিলো না। এদেশে না খেয়ে কেউ মরে না। বেকার ভাতায় চলে যায়। চাকরির সিকে কখনো ছিড়বে না এমনও নয়। জারা মাস দুই কাটিয়ে বললো, তুমি থাকো। আমি ঢাকা ফিরে যাই।

আসবে তো আবার?

না। তোমার জন্য একটা খুঁতখুঁতি ছিলো। তুমিও বিদেশ বিদেশ করতে। রাস্তা একটা ধরিয়ে দিয়ে গেলাম। এবার নিজে চলবে।

আর তুমি?

আমার কি হবে জানি না। সহজে সব পেয়ে কিছুই আর ভালো লাগে না আমার।

রকিকেও নয়?

সেও ফিকে হয়ে গেছে। পরকীয়া

আমি উদাস নিরিখে, কন্ঠস্বরে দুঃখি দুঃখি সুর ফুটিয়ে বললাম, একজনের জন্য। পরম আনন্দের। অপর পক্ষের জন্য চরম যন্ত্রণার। কাল বেলার সেই সময় বোধহয়। কাটিয়ে উঠেছি। জারা—

দুকাধে ঝাঁকানি রেখে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাকি বক্তব্য রাখলাম, দাগ দুজনেরই ছিল। ধরা যাক সুদে আসলে মিটে গেছে! সব ভুলে জীবন কি আবার বদল করা—

অসমাপ্ত কথার মধ্যে হেয়ার স্টাইল ঝাঁকিয়ে জারা প্রায় চেঁচিয়ে বললো, না না এবং না। আমরা পরস্পরের প্রতি ব্যক্তি শ্রদ্ধা হারিয়েছি। আর হয় না।

জারা চলে যাবার পর জীবন অতিষ্ঠ হবে, ভয় পেয়েছিলাম। নাহ, নতুন দেশ, পরিবেশ, কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি হওয়া, তিন বেকার বাঙালী যুবকের দু'রুম শেয়ার করা জীবন, মোটামুটি মানানসই। দুঃখ একটাই ব্যর্থ পরিণয়। এদেশে যে বিষয়ের কোনও তোয়াক্কাই নেই। আর গ্লানি, যে জারা এতো যন্ত্রণার কারণ, তারই দান হাত পেতে নিলাম। এটা নিয়ে যুদ্ধ হয় নিজের সঙ্গে। গোপন রক্তক্ষরণ..

এর মধ্যে সমবেত ধ্বনি উঠলো। কেউ ছুটলো সমুদ্রের একেবারে কিনারে। কেউ উঠে দাঁড়ালো পাথরে। সুর্যাস্ত দেখবে। আমরাও এগুলাম। চলতে চলতে জামিল প্রশ্ন রাখলো, বলতে পারেন এ ক্ষরণ কবে শেষ হবে? জীবন আবার কবে সহজ হবে আগের মতো?

লা পেরুজের মনোরম বিকালে বেড়াতে এসে মন খারাপ হয়ে গেল। আমরা হাঁটছিলাম প্রশান্ত মহাসাগরের পাড় ধরে। তিন রঙা পানির ঢেউ-এর গা ছুঁয়ে চমৎকার পাথরের ভিউ। সৈকতে পড়ে থাকা এক ধরনের অদ্ভুত পাথরের চাই।

নিটোল গোল গোল গর্ত। ভেতরটা ভরা নোনা পানিতে। এক সারে অজস্র। হঠাৎ তাকালে থমকে দাঁড়াতে হয়। এক সঙ্গে অনেকগুলো বিষণ্ণ চোখ যেনো তাকিয়ে আছে।

জামিল সেদিকে না তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো লা পেরুজ মনুমেন্টের দিকে। বল্লো, সন্ধ্যায় এখনো এই গরমেও রীতিমতো ঠাণ্ডা কিন্তু।

টের পাওয়া যাচ্ছিলো হাড়ে হাড়ে। পিকনিক করতে আমরা এসেছি সেই সকালে। রোদে তখন বেশ ঝাঁজ। বারবি কিউতে চিকেন কাবাব, কড়াইর সামান্য তেলে সসেজ ভাজা। ঘেমে ঘেমে হাত বদল হচ্ছিলো ঘন ঘন। এই সামারে সিডনির আবহাওয়ার তাপ যাই হোক, দুপুরের পর থেকে বইতে থাকে শীতল বাতাস। তবু লোজন থেকেই যায়। লা পেরুজের বিখ্যাত সূর্যাস্ত দেখার জন্য।

এই মহাদেশের এক তীরে কবে এন্ডিভার জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন ইংরেজ নাবিক জেমস কুক। তার পিছু ধাওয়া করে ঠিক উল্টো দিকের উপকূলে দুর্গ গড়েছিলো ফরাসীরা। তারই স্বাক্ষর বইছে একটি মিউজিয়াম, টাওয়ার। মিউজিয়ামটি সংস্কারের জন্য বন্ধ। তার চারদিকে সারাক্ষণ দাবড়ে বেড়াচ্ছে গোটা দুই বাঘা কুকুর। ব্রীজের এদিক থেকেও কর্কশ ডাক স্পষ্ট। জামিলের ঠোঁটে ফুটলো বাঁকা হাসি-এতো

মূল্যবান যাদুঘর পাহারা দিচ্ছে কয়েকটা কুকুর। ক্যানো জানেন? মানুষের শ্রমের দাম অস্ট্রেলিয়ায় খুব বেশি। অথচ বেকারের লাইন দিন দিন লম্বা হচ্ছে।

কোনও সাড়া না দিয়ে ওকে নিয়ে যেতে সাহায্য করলাম ওর পূর্ব প্রসঙ্গে। মানুষের কিছু লুকোন কথার সম্পদ থাকে যার ডালা সহজে তারা খোলে না। কিন্তু লক্ষ্য করেছি কবি সাহিত্যিকদের কাছে তারা আপনা থেকে ক্যানো যেনো সহজ হয়, বলার জন্য সুযোগ খোঁজে। কে জানে হয়তো, সৃষ্টিশীল কারু কাছে সাময়িক নায়ক হবার গোপন পুলক অনুভব করে, কিংবা কি পুরোপুরি আবিষ্কার করতে পারি না। তার মধ্যে আপন গরজ অথবা বলার নেশা আবার পেয়ে বসে জামিলকে-জারাকে ভালোবাসার কথা আমার মধ্যবিত্ত মা জানতে পেরে বলেছিলেন, সমানে সমানে হলে বিয়ে সম্মানের হয়।

আমি খুব বিরক্ত হয়েছিলাম। বালক বয়সে যে বাবাকে হারিয়েছি, তাকে নিয়ে আক্ষেপ কিছু ছিলো না। রাজনীতি করতেন। না থাকতেন বেশি ঘরে, না দিতে পারতেন ছোট্ট সংসার চলার মতো টাকা পয়সা। মা মাস্টারী করে যা পেতেন, কষ্টে চলতো। মাথার জোরে বুয়েটের ছাত্র হয়েছিলাম।

সে বছর ছেলেমেয়ের সংখ্যা পঞ্চাশ। জারা গুলশানের মেয়ে। পোশাকে যতো আপটুডেট ঝকমকে ছিলো, মগজে ততো নয়। আমি ওকে ডিজাইনে, মডেলিং-এ

বলতে গেলে সব কিছুতেই সাহায্য করতাম। বিয়ের প্রোপোজাল আমিই দিয়েছিলাম। তবে ভালোবাসার কথা ওই প্রথম বলেছিলো। ওর বাবা-মা অমত করেনি। শর্ত শুধু একটি, জারার সঙ্গে গুলশানে থাকতে হবে আমাকে। ওর মা খুব নরোম করে বলেছিলেন, আমাদের বাবা সন্তান বলতে দুটি মেয়ে। ফারাহ বিদেশে। জারাকে বাইরে দিয়ে এত বড় ক্যাসেলের মতো বাড়িতে বুড়োবুড়ি দম বন্ধ হয়ে মরবো।

আমার নয়, আপত্তি ছিলো আমার মাস্টার মায়ের। কিন্তু গ্রাহ্য করাটা বোকামি মনে হয়েছিলো। আরকিটেকচর পাস করার পর ফার্ম খুলে বসলাম। দিনভর এক সঙ্গে থাকা, কাজ করা। মনে হচ্ছিলো পৃথিবীতে দুঃখ বলে কিছু নেই। ঈশান কোণে মেঘ জমছিলো টের পাইনি। এম এস করার জন্য দুজনই এপ্লাই করেছিলাম। এআইটিতে চান্স পেলো জারা। বাবা মার সঙ্গে আমাকে ক্যাসেলে রেখে চলে গেল থাইল্যাণ্ড। প্রথম বছরের ছুটিতে বেড়াতে এলো। স্বপ্ন দেখালো ফিরে এসে আরও জমকালো করবে ফার্মের চেহারা।

ভাবলাম একটাই তো বছর আর। দেখতে দেখতে চলে যাবে।

ব্যক্তিগত কথার চেয়ে জারার চিঠিতে পরের বস্ত্র বেশি জায়গা নিতে শুরু করলো থাইল্যান্ডে ভূস্বর্গ চিয়াংমাই ভ্রমণ, পাতাইয়া, ফুকেত, ফ্যান্টাসিল্যান্ড শ্যায়াম ওয়াটার

পার্কের আনন্দময় বিবরণ-জানো জামিল গোল্ডেন ট্রাঙ্গেল চিয়াংমাইতে বেড়াতে গিয়ে দু'চোখের পাতা আর এক করতে পারি না। লালে লাল পপি, নীল সমুদ্র, সবুজ পাহাড়। তবে নিসর্গ তখনি অর্থময় যখন পাশে থাকে একান্ত কাঙ্ক্ষিত কেউ।

চিঠি নয়, অস্থির হয়ে ফোনে জানতে চাইলাম, কাদের সঙ্গে ঘুরছো? বন্ধুদের। দল বেঁধে বেড়াতে যাই গো, দল বেঁধে।

চৈতন্যে মেঘলা আকাশ। শেষের অন্তরঙ্গ টানা সুরটিতে কেটে যেতে দেরি হয় না। কিন্তু তক্ষণি ক্যানো যে চোখ যায় টিভির মাথায় আমাদের বাঁধানো যুগল ছবিটার দিকে। থার্ড ইয়ারে বুয়েট থেকে এসকারশন ট্রিপে আমরা ভারতে গেছিলাম। সেখানকার যে যে শহরে রয়েছে প্রাচীন এবং অতি আধুনিক অট্টালিকা, সেইসব দর্শন ছিল এই ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। বাঙ্গালোরের চমৎকার এক স্থাপত্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা দুজন। খুব ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে। যেন হঠাৎ ঝলকানির মতো মনে পড়লো ঐ ট্যুরের এক শুক্লপক্ষের সন্ধ্যায় আরব সাগরের পাড়ে জারা আমায় ভালোবাসার কথা বলেছিলো। প্রথম ভালবাসার বার্তা নয়ত, মহাকাশ থেকে আসা দুরাপ মদুবাক্য।

পরদিন সকালে আবার দেখা হতে আমি বলিছিলাম, জানো কাল সারারাত আমি শুধু চাঁদ দেখেছি।

কি আশ্চর্য আমিও তো।

আর গুনগুন করেছি, আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়, মনে পড়ে মোরে প্রিয়...

ধাৎ, আমি গেয়েছি লাভ ইজ হেবেন, লাভ ইজ লাইফ।

ঐ একই হলো। যাদের মনের মিল হয় তাদের চিন্তা ভাবনাগুলোও একই দিকে শাখা প্রশাখা মেলতে থাকে।

নো ডিয়ার এটা ঠিক নয়। ভালোবাসা মানে একে অন্যের পদদাস বনে যাওয়া নয়। আমরা দুটি আলাদা মানুষ কিন্তু সবকিছুতে মিল থাকবে এমন ভাবা বোকামি। আসলে তুমি এদ্দিন আমার সঙ্গে আছো মিডল ক্লাস নেচারটা থেকে পুরোপুরি বেরুতে পারছে না। মানে যাকে বলে ফুল এডজাস্টমেন্ট।

নির্মোহ মাপকাঠিতে যুক্তিগ্রাহ্য কথাগুলো আমাকে কেমন কারেন্ট শক খাওয়াতো। কিন্তু মগ্ন আচ্ছন্নতাই জয়ী হতে শেষ পর্যন্ত।

জারার এখনকার জীবন নিয়ে বাঁকা চোখে দেখা মানে রদ্দি ভাবনায় যাওয়া। কিন্তু যা চাই না সেই বলয় ক্রমাগত ধাবমান আমারই দিকে। প্রকৃতির সঙ্গে একজন পুরুষ স্পষ্ট হচ্ছে প্রতি হপ্তার চিঠিতে জানো–জামিল এ বছর আইটিতে জয়েন করেছে। জুনিয়র ব্যাচের রকি। দুর্দান্ত আবৃত্তিকার। নাচে দক্ষ। মে দিবসের জন হেনরীর

নৃত্যনাট্যে নাম ভূমিকায় সে, প্রেয়সী স্ত্রীর রোলে জারা। হাতে-গলায়-মাথায় শ্বেত ফুলের মালিকায় অশ্রুময়ী জারা সত্যি যেনো কাঁদছে হাতুড়ি ধরা মৃত স্বামীর জন্য। ছবিটা দেখতে দেখতে জ্বলি। জ্বলতে জ্বলতে হাতের পিঠে চোখ মুছি। আর সন্দেহ নেই। জারা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।

কোথাও স্বস্তি শান্তি নেই। ব্যাপারটা এমন কাস্ত্রে বন্ধুকেও বলা যায় না চট করে? বড়জোর কেউ বলবে ভুল দেখছি। কেউ করবে বিদ্রূপ।

হঠাৎই মনে পড়লো মাকে। কতোদিন যেতে বলেছেন। কান দেইনি। এখন খুব জরুরী মনে হচ্ছে তার সান্নিধ্য। কিছু উপহার নিয়ে মফস্বলে গেলাম। জিনিসপত্রের দিকে ফিরেও তাকালেন না। শুধু বঙ্গেন, টেলিপ্যাথির ডাক সত্যি শুনেছি। গোলাপবাস আমগাছে এবার এতে ফল এসেছে ঘড়ি ঘড়ি তোকেই শুধু মনে পড়ছে।

কি আশ্চর্য মফস্বলের এই ছোট্ট শহরে ঢাকায় পড়তে যাবার আগে আমার যে একজন ফিয়াসে ছিলো তার কথা একবারও মনে হয়নি। পৌঁছানোর দু'ঘণ্টার মধ্যে মনে করাতে সেই এলো। একটু চটকদার বেশভূষা ছাড়া পরিবক্স তেমন চোখে পড়লো না বল্লো, এদ্দিন পর আমাদের মনে পড়লো।

তো, তা তুমি কি করছে?

ঘরসংসার।

রেসা হেসে পরক্ষণে বল্লেন, বলবে তো মান্ধাতা আমলের একঘেয়ে কাজ। তুমি বলেছিলে ঢাকায় নিয়ে গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে জোট বেঁধে দেবে। সংসার করবো। আবার প্রতিভা দিয়ে সমাজ সংস্কৃতি বোও করবো।

কিন্তু আমি না হয় কথা রাখতে পারি নি।

আর একজনের বেলাও সেটা আশা করা যায় না। তুমি তো বু শহুরে হয়েছিলে ও একেবারেই মফস্বলের মানুষ।

শুনেছিলাম ট্রাকের বড় ব্যবসায়ী।

পয়সা মেলাই আছে। কিন্তু স্ত্রীকে স্টেজে দেবার উদারতা কি থাকে সবার মধ্যে। তা সখ পুরণ না হোক। ভেবে দেখেছি এই দেশে ঘরে ঘরে শিল্পী। তাদের কেউ খুবই উন্নতি করতে যদি সুযোগ পেতো। তা পায় তো লক্ষে একজন। আমি তা আশা করে ব্যর্থ হয়ে সামলে নিয়েছি।

তাহলে তুমি সুখী মনোয়ারা।

তা বলতে পারো। মানুষটা ভালো। শাশুড়ীদের সঙ্গে থাকতে হয় না। আধপূরান একটা ফিয়াট আছে নিজস্ব। হাতখরচাও মাসে মন্দ পাই না।

মা এলেন খাবার হাতে। ফ্যাকাশে হেসে বল্লেন, তুই কি এসব শোনাতেই সাত তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছিস?

উম চাচী। সুখটা কারো একার সম্পত্তি নয়, তোমার ছেলেকে না শুনিয়ে শান্তি পাচ্ছিলাম না। ভয় হচ্ছিলো আবার কবে আসবে বা উড়াল দেবে ফিরতি ট্রেনে কে জানে। যে অস্থিরমতি ছেলে তোমার। তাই দৌড়ে আসা।

মনোয়ারা স্পষ্টবাদী কিছু ছিলো, কিন্তু এতোটা নয়। আমি অপমানিতবোধ করেছি কিন্তু রেগে উঠতে পারিনি। প্রিয়-প্রত্যাখ্যানের যে তাপ একদিন ওকে দমে দমে বহন করতে হয়েছে সেই জ্বালা এখন আমার বুকে। যে দহন মা নয়, বন্ধু নয় কেউ কমাতে পারে না। এটা ডিসেম্বর অব্দি ভোগ করতেই হবে। ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে জারা চলে আসবে।

পরীক্ষার মধ্যেই জারা জানালো ওর আসা হবে না। এআইটিতে ও একটা চাকরি পেয়েছে। তাছাড়া, সে চলে এলে রকির পাস করে বেরুনো মুশকিল হবে।

অনাহূত আমিই গেলাম বড়দিনের ছুটিতে। জারা এবং রকি পার্টটাইম চাকরি করছে। দুজনে মুখোমুখি ফ্ল্যাট ভাড়া করে আছে। ওদের প্ল্যান ছিলো ট্রেনে করে মালয়েশিয়া ভ্রমণ। দলের সঙ্গে রকি গেল, জারা রইলো। ভয়ংকর রাগ হলো।

বল্লাম, চাকরির কি তোমার কোনও দরকার ছিলো? আর কোথাকার কোন রকি পাশ কি ফেল করলো তাতে তোমার কি যায় আসে? উম।

জারা চোখ নাচিয়ে জবাব দিলো, যায় আসে বৈকি, ও ভালো থাকলে আমি ভালো থাকি।

আর আমি যে এদিকে জ্বলে অংগার হয়ে যাচ্ছি।

অত মিন হচ্ছে ক্যানো?

কারণ আমি তোমায় ভালোবাসি।

ভালোবাসার মানুষ ভালো থাকলে তো খুশী হবার কথা।

সে যুগ পাল্টে গেছে।

তার মানে?

ভালোবাসার মানুষ পরকীয়ায় ভালো থাকলে আমি ভালো থাকতে পারি না। তার ভালো থাকা দেখে আমার চোখ টাটায়, বুক জ্বলে, বিষাক্ত হয়ে যায় দিবারাত্রির স্বাদ।

নাঃ স্বীকার করতেই হয় গুলশানের ক্যাসেলে থেকে তুমি অনেক সাহসী এবং পরিপুষ্ট হয়েছে।

কথার ভেতর আইব্রাসে চোখের পাতা লালচে করতে করতে বললো, কি শব্দটা বপ্নে যেনো-পরকীয়া। উম বাংলায় ঐ একটি চমৎকার শব্দ আছে, ছোট্টর ভের যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। হা করি পরকীয়া। স্বাদটা যে নিষিদ্ধ ফল খাবার মতো সর্বনেশে সুন্দর তুমিও তো জান।

আমি?

ইস এরই মধ্যে ভুলে গেলে। মনোয়ারার সঙ্গে বিয়ে না হোক, আমার সঙ্গে প্রেম করার পর যন্ত্রণা সে কি কোনও স্ত্রীর চেয়ে কম পেয়েছিল?

হাবিজাবি কথা রেখে স্পষ্ট বলল কি করতে চাও?

আমার যদ্দিন ভালো লাগবে আমি এমনি জীনযাপন করবো।

তাহলে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়াই তো ভালো।

হোক এক্ষণি।

চোখের পাতায় বাড়তি কয়েকটা পলক ফেলে বললো, যদি তুমি চাও।

মুখে যাই বলি, বুকে জোর পাই না। কি করব সে সিদ্ধান্তেও আসতে পারি না। তবে এটা পরিষ্কার আমার মধ্যে জারার জন্য যে ভালোবাসার গাঢ় অনুভূতি ছিলো, সেটা ফিকে হচ্ছে। ক্ষয় ধরেছে সম্পূর্ণ স্ট্রাকচারে। ভেতরের দাহ, বাইরের অপমান।

ঘনিষ্ট বলয়ে ব্যর্থ বিয়ে একটি মজাদার প্রসঙ্গ। মাঝে মাঝে মার সেই কথাই মনে হয়, বিয়ে সমানে সমানে হলে সম্মানের হয়।

ক্রিসমাসের ছুটি সে কাটায় রকির সঙ্গে নাচানাচি করে, আমি নানা রং-এর বোতল টেনে কুঁদ হয়ে পড়ে থাকি অফিসে।

গুমোট পরিস্থিতি হঠাৎ কাটলো যেনো। জারা ফোনে বললো, এ্যাই ইমিগ্রান্ড হয়ে আমি সিডনি যাচ্ছি। এই সুযোগে তোমাকেও আনতে পারি। আসবে?

জানি না ক্যানো রাজী হয়ে গেলাম। মা এবার চোখের পানি ঝরিয়ে ছোট্ট করে বললেন, তবু তো চোখের কাছে ছিলি।

কি করবো আমার কোনও কন্ট্রোল নেই বুঝি নিজের ওপর। জারা এয়ারপোর্টে রিসিভ করলো। দুঘরের সাজানো ফ্ল্যাট। জানালা থেকে নীল সমুদ্র দেখা যায়। বিশ্বের দুর্লভ স্থাপত্য অপেরা হাউসের খানিকটা।

জারা দুরে থাকলে দুশ্চিন্তায় ভুগি। কাছে এলে সব ভুলে যাই। বুঝি না কি ওর মতলব। কুয়েত-ইরাক যুদ্ধের পর এখানকার অর্থনীতির অবস্থা নাজুক। বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। ডিগ্রী-মতো কাজ হচ্ছে না। কম্পিউটারের যুগ। সে বিষয়ে নতুন করে পড়ছে কেউ কেউ। ডাল ভাতের ভাবনা আমাদের ছিলো না। এদেশে না খেয়ে

কেউ মরে না। বেকার ভাতায় চলে যায়। চাকরির সিকে কখনো ছিড়বে না এমনও নয়। জারা মাস দুই কাটিয়ে বললো, তুমি থাকো। আমি ঢাকা ফিরে যাই।

আসবে তো আবার?

না। তোমার জন্য একটা খুঁতখুঁতি ছিলো। তুমিও বিদেশ বিদেশ করতে। রাস্তা একটা ধরিয়ে দিয়ে গেলাম। এবার নিজে চলবে।

আর তুমি?

আমার কি হবে জানি না। সহজে সব পেয়ে কিছুই আর ভালো লাগে না আমার।

রকিকেও নয়?

সেও ফিকে হয়ে গেছে। পরকীয়া

আমি উদাস নিরিখে, কণ্ঠস্বরে দুঃখি দুঃখি সুর ফুটিয়ে বললাম, একজনের জন্য। পরম আনন্দের। অপর পক্ষের জন্য চরম যন্ত্রণার। কাল বেলার সেই সময় বোধহয়। কাটিয়ে উঠেছি। জারা—

দুকাধে ঝাঁকানি রেখে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাকি বক্তব্য রাখলাম, দাগ দুজনেরই ছিল। ধরা যাক সুদে আসলে মিটে গেছে! সব ভুলে জীবন কি আবার বদল করা—

অসমাপ্ত কথার মধ্যে হেয়ার স্টাইল ঝাঁকিয়ে জারা প্রায় চেঁচিয়ে বললো, না না এবং না। আমরা পরস্পরের প্রতি ব্যক্তি শ্রদ্ধা হারিয়েছি। আর হয় না।

জারা চলে যাবার পর জীবন অতিষ্ঠ হবে, ভয় পেয়েছিলাম। নাহ, নতুন দেশ, পরিবেশ, কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি হওয়া, তিন বেকার বাঙালী যুবকের দু'রুম শেয়ার করা জীবন, মোটামুটি মানানসই। দুঃখ একটাই ব্যর্থ পরিণয়। এদেশে যে বিষয়ের কোনও তোয়াক্কাই নেই। আর গ্লানি, যে জারা এতো যন্ত্রণার কারণ, তারই দান হাত পেতে নিলাম। এটা নিয়ে যুদ্ধ হয় নিজের সঙ্গে। গোপন রক্তক্ষরণ..

এর মধ্যে সমবেত ধ্বনি উঠলো। কেউ ছুটলো সমুদ্রের একেবারে কিনারে। কেউ উঠে দাঁড়ালো পাথরে। সুর্যাস্ত দেখবে। আমরাও এগুলাম। চলতে চলতে জামিল প্রশ্ন রাখলো, বলতে পারেন এ ক্ষরণ কবে শেষ হবে? জীবন আবার কবে সহজ হবে আগের মতো?